সমস্যাসংকুল মুসলিম বিশ্ব

সাঈদ রামাদান

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

আল কুরআন

মানবজতির মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অপর (শক্তি)-কে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমতুল্যরূপে গ্রহণ করে এবং তাকে এরূপ ভালোবাসে যেরূপ ভালোবাসা উচিত একমাত্র আল্লাহকে। অথচ প্রকৃত ঈমানদার লোকগণ আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসে। (আল-বাকারা: ১৬৫)

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ করো এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া। নিশ্চয়ই এতে ঐসব লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে। (আল-রুম: ২১)

আপনার মতে মুসলিম বিশ্বের কোন সমস্যাগুলোর প্রতি ইসলামের কর্মীদের একান্ত গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন? আর সে সবের কি ধরনের সমাধানের জন্য তাদের সবটুকু অথবা অধিকাংশ শক্তি একান্তভাবে নিয়োজিত করা দরকার বলে মনে করেন?

> গত ত্রিশ বছর যাবত ইসলামের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, এমন এক বন্ধুর প্রতি ছিল আমার এই প্রশ্ন। তিনি বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে ছিলেন এবং এরপর বলেছিলেন, আমি তিনটি সমস্যাকে মুসলিম বিশ্বের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী বলে মনে করি। এক, আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে ও তাঁর রাসূলের (সা) সুন্নাহতে যে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন এবং আমাদের আইনবেত্তাগণ তা থেকে যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন- এই দুয়ের পার্থক্য নির্ণয়ে আমাদের অপারগতা। দুই, মুসলিম সমাজে নারীদের দুর্দশা এবং তিন, নেতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন- এ কথাটির অর্থকে ভুলভাবে অনুধাবন করার ফলে শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা, জুলুম এবং এ ধরনের প্রতিটি কার্যকলাপে নীরব থাকার মাধ্যমে প্রশ্রয় দেয়া, নির্লজ্জভাবে মদদ যোগানো, আর এসব কিছুই মেনে নেয়া।

সংক্ষিপ্ত এই পর্যবেক্ষণের পর বিষয়টি বিস্তৃত হলো দীর্ঘ আলোচনায়- সমস্যাগুলো গুরুত্ব এখানে যেমন পূর্ণ স্বীকৃতি অর্জন করেছিল, তেমনি আমরা উপলব্ধি করছিলাম যে, সে সবের আশু সমাধানের জন্য প্রয়োজন আন্তরিক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। সমস্যাগুলোর গুরুত্ব স্বীকার এবং বিরাজমান পরিস্থিতি পাল্টে দেয়ার জন্য নিজের ভেতর এক তীব্র তাড়া অনুভব করছিলাম আমি। আমার এই পণ্ডিত বন্ধুটি আলোচনায় যতই অগ্রসর হচ্ছিলেন, আমার মনে হচ্ছিল তিনি যেন একজন ডাক্তার। তার আঙুলগুলো ব্যস্ত আছে ক্ষতস্থান নির্ণয় এবং পরীক্ষা করার কাজে। অসংখ্য রোগের মধ্যে এই তিনটি সমস্যা সত্যিকারের অর্থেই দখল করে আছে অগ্রগণ্য অবস্থান যা আমাদের নানাভাবে পীড়িত করে তুলছে। তার ওপর এই রোগগুলো ক্রমশই ক্রনিক (Chronic) হয়ে যাচ্ছে। ফলত আমরা তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

শরীয়াহ্ এবং ফিক্হ-এর পার্থক্যঃ

প্রথম সমস্যাটি হলো- একদিকে আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং তাঁর নবীর সুন্নাহর মাধ্যমে আমাদের জন্য যা রেখেছেন এবং অন্যদিকে তার উপর ভিত্তি করে আমাদের আইনবেত্তাগণ যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়েছেন- এ দু’য়ের পার্থক্য নিরূপণে আমাদের ব্যর্থতা। ব্যর্থতার কথা বলতে গিয়ে আমরা যেমন চাই না আমাদের ফুকাহা থেকে প্রাপ্ত মতামত (Opinion)-এর মূল্যকে অস্বীকার করতে, তেমনি চাই না সম্মানিত এই ব্যক্তিদের কোনোভাব অমর্যাদা করতে। বরং আমরা বিশ্বাস করি, তাদের কৃতিত্ব (work) আমাদের সম্পদ ভাণ্ডারে যোগ করেছে মহামূল্যবান ঐশ্বর্য- আমাদের তো অবশ্যই এজন্য গর্ব অনুভব করা উচিত। আমরা বিশ্বাস করি, তাদের পাণ্ডিত্যের সূক্ষ্মতার বিষয়ে আমাদের ব্যাপক পড়াশোনা ও গবেষণা করা দরকার। আর দরকার তাদের এই মূল্যবান কর্ম থেকে যত বেশি সম্ভব কল্যাণ লাভ করা। তবে একই সাথে যেটা প্রয়োজন তা হলো, আমাদেরকে স্বচ্ছ ধারণা নিতে হবে নিচের পয়েন্টগুলোতে:

১. শুধুমাত্র কুরআন এবং সুন্নাহ শরীয়াহ্ গঠন করে। আর শরীয়াহ্ হলো আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধান যা মেনে চলা মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক। শুধুমাত্র এই দু’টি উৎসই মুসলিম উম্মাহর আদর্শিক (ideological) এবং বাস্তব জীবনের ভিত গড়ে।

২. যতদিন না মানুষ তার বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ থেকে দূরে সরে যায় ততদিন পর্যন্ত কুরআনের কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদানে অথবা রাসূলের (সা) হাদিসের নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে মতভেদ থাকাটা বিচিত্র বা আশ্চর্যজনক কিছু নয়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো কুরআন ও সুন্নাহর দলিল (Text)। এর ভিত্তিতেই এই মতভেদে যুক্তিতর্কের অবতারণা থাকতে হবে এবং বিতর্কিত কোনো ইস্যুতে কোনো মাযহাবের মতামতকে অসতকর্তা বা অজ্ঞাতাবশত যে কারণেই হোক না কেন, এই পর্যায়ে উন্নীত করা উচিত হবে না যে তা কুরআন ও সুন্নাহর চেয়ে বেশি কর্তৃত্বশালী হয়ে যায়। নতুবা সেটা এক ধরনের বিচ্যুতি হবে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর বিধানের প্রতি সঠিক মনোভাব পোষণের অন্তরায় হতে পারে।

কুরআনে এ বিষয়ে বলা হয়েছে: “তাদের মাঝে বিচারের মীমাংসা করে দাও যা আল্লাহতায়ালা নাযিল করেছেন তারই ভিত্তিতে এবং কখনো তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।” (৫ : ৪৯) আমাদেরকে আরও সতর্ক থাকতে হবে যেন বিতর্কিত কোনো বিষয়ে আমাদের মনোভাব এত বেশি কঠোর না হয় যে এই কট্টরতা শরীয়াহ্‌কে, বোঝার জন্য মুসলিমদের নিজ নিজ মেধার প্রয়োগে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। যদিও যাবতীয় মতভেদের মানদণ্ড হিসেবে শরীয়াহ্ নিজেই উপস্থিত রয়েছে। আর প্রতি প্রজন্মের মুসলিমদের জন্যই আল্লাহতায়ালার একটি বিশেষ হুকুম (ordinance) কার্যকর রয়েছে যা মুসলিমদেরকে সর্বাবস্তায় শরীয়াহ্‌র সাথে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ রাখতে আদেশ করে। বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে:

“অতঃপর তোমাদের মাঝে যদি কোনো ব্যাপারে মতোবিরোধ দেখা দেয়, তবে সেই বিষয়ের ফয়সালার ভার অর্পণ করো (refer) আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসূলের ওপর।” (৪:৫৯)

একেবারেই কুরআনের দ্বারস্থ না হয়ে কারো নিজ নিজ মাযহাবকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়ার ফলে আমাদের অতীত প্রজন্মের ফুকাহার প্রতি যে মনোভাব সূচিত হয় তা অযৌক্তিক। অথচ এইসব মনীষীরা বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করলেও নিজ নিজ মতামতকে (Opinion) ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে বলে কখনও দাবি করেননি। শরীয়াহ্‌র যে দলিল (Text) তাদের কাছে উপস্থিত ছিল, এই দলিলের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তারা করেছিলেন- তার ওপর ভিত্তি করে বিতর্কিত বিষয়ে তাদের মতভেদে ঘটেছিল। কুরআন ও সুন্নাহর নূর বিকিরণে অভেদ্য বাঁধার প্রাচীর হয়ে কখনও দাঁড়াননি কোনো একজন ফকীহ (আইনবিদ, ফুকাহা বহুবচনে)। অথবা কখনো এমনও হয়নি যে, কুরআন ও সুন্নাহ অনুধাবনের জন্য অন্যান্য মুসলিমকে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত করতেন। ইমাম মালিক এই প্রশ্নে খুব চমৎকারভাবে তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন:

“আমি একজন মানুষ। আমি সঠিকও হতে পারি, ভুলও করতে পারি। আমার প্রতিটি মতামতকে যাচাই করুন। যা কিছু কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হবে, শুধু সে সবই গ্রহণ করবেন, আর যা কিছু কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হবে না, সেটুকু বর্জন করুন।

৩. কুরআন ও সুন্নাহ’তে বিবৃত শরীয়াহ্ দুনিয়াবী লেনদেন, দৈনন্দিন আদান-প্রদান বা মু’আমালাত (worldly dealings)-এর ব্যাপারে মানুষের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি। বরং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্য দিয়েছে কিছু সাধারণ (broad) নীতিমালা এবং কয়েকটি প্রয়োজনীয় হালাল-হারামের বিধান (injunction)। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে (details) হুকুম-আহকাম প্রদানের ক্ষেত্রে শরীয়াহ্ খুব কমই নিজেকে নিয়োজিত করেছে। মৌলিক নীতিমালা (broad principles) প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ (confinement) থাকা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শরীয়াহ্‌র নীরব থাকার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহতায়ালার হিকমত ও তাঁর দয়াশীলতা। তাঁর হিকমতই বেষ্টন করে আছে মানবজীবনকে সবদিক থেকে, সমগ্রতায়, জীবনের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, উন্নয়নের প্রতিটি ধাপে, মানব ইতহাসের প্রতিটি পর্যায়ে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সবকয়টি বিষয়ের জন্য একটি করে হালাল-হারামের হুকুম

জারি বা মানবজীবনের সম্ভাব্য প্রতিটি সমস্যা মোকাবিলার জন্য একটি করে বিধান প্রদানে আল্লাহতায়ালা তো মোটেই অক্ষম ছিলেন না যদি তিনি মনে করতেন যে সেটা করাই আমাদের জন্য কল্যাণকর হতো।

ঐ সব বিষয়ে শরীয়াহ্‌র নীরব থাকার কারণ বোঝার জন্য আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কুরআন শরীফের আয়াতটি- ‘আল্লাহ্ বিস্মরণশীল নন’। এর একমাত্র অর্থ হলো মানবজীবনের বিচিত্র খুঁটিনাটি বিষয়ে শরীয়াহ্’র সাধারণ মূলনীতি সম্পন্ন আহকামে (general injunction) প্রয়োগ এবং মাস্‌লাহা (জনকল্যাণের নীতি) অনুযায়ী নতুন নতুন সমস্যা মোকাবিলার বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হয়েছে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সচেতন অংশটির বিচক্ষণতা ও বিচার বুদ্ধির ওপর। যে সব বিষয়ে মানুষ ভবিষ্যতে মতভেদ করতে পারে অথবা মানব অস্তিত্বকালে যেসব সমস্যার উদ্ভব হতে পারে বলে আল্লাহ জানতেন এমন সব বিষয়ে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট আদেশ নিষেধ জারি করা থেকে শরীয়াহ্ যদি বিরত থাকে এবং এমন সব সমস্যার সমধানের জন্য ধার্য করে না দেয় কোনো স্থির নিয়ম-প্রণালী, তবে তা আল্লাহতায়ালার দয়াশীলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, তিনি মানুষের জন্য সহজতা চেয়েছেন, স্বস্তি চেয়েছেন, কাঠিন্য নয়। তিনি মানুষের জন্য চেয়েছেন প্রশস্ততা, সংকীর্ণতা নয়।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে: আল্লাহ তোমাদের জন্য চান সহজতা, কঠোরতা নয়। (১১:১৮৫) রাসূল (সা) একে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে; “আল্লাহ কিছু বিষয়ে তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। কাজেই এসব বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করো না। তিনি কিছু বিষয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, সে সবের ধারে কাছেও যেও না। বহু বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন তাঁর দয়া ও সুবিবেচনার কারণে। কাজেই এসব বিষয়ে আমাকে কোনো প্রশ্ন করো না।”

রাসূল (সা) এই বিষয়টির ওপর বারবার জোর দিয়েছেন। শরীয়াহ্‌র এই দিকটি সম্পর্কে সর্বাধিক ব্যাখ্যামূলক বলা যায় তাঁর নিম্নোক্ত নির্ভরযোগ্য হাদিসটিকে:

“আমাকে প্রশ্ন করো না যতক্ষণ কোনো বিষয়ে আমি নীরব থাকি। অতিরিক্ত প্রশ্ন সর্বনাশ ডেকে এনেছিল তোমাদের আগে গত হয়ে যাওয়া কওমের জন্য। কেবলমাত্র যদি কোনো বিষয় আমি নিষেধ করি তা করবে না। আর যদি কোনো বিষয়ে আদেশ করি তবে চেষ্টা করো এর যতখানি সম্ভব পালন করতে।”

এই স্বাধীনতা আল্লাহতায়ালাই অনুমোদন করেছেন এবং অপার করুনা ও দয়াপরবশ হয়ে তিনি মানুষের জন্য রেখেছেন হালাল ও হারামের দুই সীমানার মাঝে বেছে নেয়া যায় এমন এক বিস্তৃত দিগন্ত। শরীয়াহ্ এভাবে অর্জন করেছে এক কালোত্তীর্ণ ও রহমতে পরিপূর্ণ বিশেষত্ব। কাজেই অতি ক্ষুদ্র বিষয়কে অতীতের আইনবিদ (legist) প্রণীত নিয়ম-প্রনালী অনুযায়ী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে সেটা হবে শরীয়া’র এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও অভিপ্রায়ের প্রতি ভয়াবহ অকৃতজ্ঞতা (ingratitude) পোষণ এবং সুস্পষ্ট অমর্যাদা প্রদর্শন। ফিকহ শাস্ত্রের এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে মানুষের মনে ক্রমশ এমন এক ভ্রান্তধারণা জন্ম নিয়েছে, অনন্তকালব্যাপী যার বৈধতা (validity) প্রশ্নতীত বলে বিশ্বাস করা হয়। আর অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে, যখনই ‘শরীয়াহ্’ শব্দটির উল্লেখ করা হয় তৎক্ষণাৎ মাযহাবগুলোই শব্দটির অর্থ হিসেবে মানুষের মগজ দখল করে নেয়। আল্লাহতায়ালার রহমতের সৌন্দর্য আর করুণার যে চিরন্তন নির্মলতা এবং স্বচ্ছতা, তার পথে এহেন মনোভাব প্রাচীর তুলে দেয়।

আমরা যারা ইসলামের পুনর্বিকাশের জন্য সংগ্রাম করি, তাদের উচিত জনগণকে যথেষ্ট স্পষ্ট করে বুঝানো যে এই হচ্ছে শরীয়াহ্- ‘নির্ভরযোগ্য শরীয়াহ্’, কুরআন ও হাদিস যেভাবে তাকে কাঠামো দিয়েছে এবং আল্লাহতায়ালা আপনাদের জন্য এই এই বিষয়েগুলো বাধ্যতামূলক করেছেন, আর কিছুই নয়। জীবনের যেসব সমস্যার ব্যাপারে শরীয়াহ্ নিশ্চুপ থেকেছে, এমন বহু বিষয়ে একের পর এক সংকটের মুখোমুখি হয়ে আমাদের মহান পূর্বপুরুষেরা মাস্‌লাহা (public interest)-এর আলোকে এবং নিজ নিজ সমকালের প্রেক্ষাপটে শরীয়াহ্‌কে যেভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, তাদরে কঠোর সাধনা ও গবেষণার ফসল পেয়ে আজ আমরা তাদের ফিক্‌হী উত্তরাধিকারী। এই উত্তরাধিকার থেকে লাভবান হবার পাশাপাশি শরীয়াহ্ সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে আমাদের পূর্বপুরুষদের মতোই। একে অনুধাবন করার জন্য আমরাও আমাদের বুদ্ধিকে (mind) কাজে লাগাবো তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে। আমাদেরও উচিত হবে নিজেদের যুগের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় আনা, যেমন করেছিলেন তারা। আমাদের উচিত হবে মাস্‌লাহাহ্’র আলোকে নিজেদের বিশেষ সংকটের মোকাবিলাতে সচেষ্ট হওয়া, যেমন তারাও করেছিলেন।

এসব কিছু মাথায় রেখে এবং নিজেদের বিশাল ফিক্‌হী উত্তরাধিকারকে সাথে নিয়েই ফিক্‌হ সম্পর্কিত আমাদের পুনঃসংস্কার কর্মসূচি হতে হবে এরকম- যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সরাসরি সম্পৃক্তিতে বাধা প্রদানের বদলে এই দুই মৌলিক উৎসের সাথে আমাদের বন্ধন হবে আরো মজবুত। আমাদের পরিস্থিতিকে কুরআন ও সুন্নাহ’র ভিত্তিতে বোঝার এবং সমাধানের এই কর্মসূচি সহায়ক ভূমিকা রাখবে, যেমন রেখেছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের বেলায়। বিগত দিনের আইনবিদরা তাদের কালের

প্রেক্ষাপটে সমস্যার যে সমাধান দিয়েছেন সেই সমাধানকে আমাদের সমকালীন সংকটের ক্ষেত্রে হুবহু প্রয়োগ হবে একবারেই অবাস্তব। কেননা দু’টি কালের ব্যবধান এমন যে এ যুগের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তাদের কোনো প্রকার জ্ঞানই ছিল না। যে প্রেক্ষাপটের আর কোনো অস্তিত্বই নেই তার জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়াও হবে একবারেই অবাস্তব। সেই সাথে ইসলামকে বোঝার জন্য নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তার চর্চা থেকে বিরত থাকা হবে পুরোপুরি অর্থহীন। কেননা, এটাই হলো যুক্তিকে পরখ করে, বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে কোনো কিছুকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা, যা আমাদের প্রত্যেককেই দান করা হয়েছে এবং নিজেদের এই ক্ষমতার সুপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের কারণে আমরা আল্লাহতায়ালার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকব।

> আর বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা থেকে নিস্ক্রিয় থাকার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদেরকে পরিণত করব এমন এক পরজীবী প্রাণীতে যারা অনন্তকাল ধরে উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া পূর্ব পুরুষদের পরিশ্রম, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, অবিরাম প্রচেষ্টা আর অধ্যবসায়ের ফসল খেয়ে বেঁচে থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে, “তাহলে আপনি কুরআন সুন্নাহ এবং ফকীহ্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কোনখানে পার্থক্যসূচক দাগ টানতে চান? কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক মর্মার্থ উপনীত হওয়ার জন্যই কি ফকীহ্দের এসব উদ্যোগ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যথেষ্ট নয়?” প্রশ্নটি খুবই যুক্তিসঙ্গত। এর উত্তর হলো- এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার মানে এই নয় যে আমরা ফিকহ্শাস্ত্র ছাড়াই চলতে চাই। আসলে ঠিক তার উল্টোটাই। আমাদের সর্বাত্মক আকাঙ্ক্ষা হলো- কুরআন ও সুন্নাহকেই পথ নির্দেশনার খাঁটি উৎস হিসেবে স্পষ্টভাবে বিবেচনায় রাখা। একেই আমাদের জীবনের গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি (norm) হিসেবে স্বীকার করা। এ কথা যে- এই দুই উৎসই শুধুমাত্র শরীয়াহ্ তৈরি করেছে, যে শরীয়াহ্ আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক (binding) হয়েছে। যাবতীয় মতামতকে ওজন করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে। নবী (সা)-এর পর কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। যেসব বিষয়ে কোনো অকাট্য দলিল আমরা কুরআন ও সুন্নাহতে পাই না- এমন প্রতিটি বিষয়ে মাস্লাহা হবে বাধ্যতামূলক। আর জনকল্যাণের ধারাণা তো স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। আগের ফকীহ্বিদেরা এই ধারণাকে শক্তিশালী প্রমাণ করেছেন এই বলে যে- “যেখানে জনগণের কল্যাণের নীতি কাজ করে, সেটাই হলো আল্লাহতায়ালার পথ।”

আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াহ্ (কুরআন ও সুন্নাহতে যা প্রদত্ত হয়েছে)- এটা চিরন্তন বাধ্যতামূলক এবং এর আলোকে ফুকাহা কর্তৃক প্রণীত খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কিত মাসআলা-এ দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আলোচিত হয়েছে, সমসাময়িক মুসলিমদের ওপর তার বিভিন্ন দিক থেকে ইতিবাচক প্রভাব থাকতে হবে। এই পার্থক্যের সুপ্রভাব ইসলামী আদর্শকে সরলতায় ভূষিত করে, যা দিয়ে আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি মুসলিমদের অন্তরের গভীরে খাঁটি ঈমানের বীজ বপনে সহায়তা করা উচিত। এটি ইসলামের বক্তব্যের (original message) সহজতাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

এটি স্বয়ং আল্লাহতায়ালার বাণী ও রাসূলের (সা) হাদিসের কারণে ইসলামী আদর্শ যে জৌলুষ পেয়েছে তাকেও পুনরায় ফিরিয়ে আনে। বিভিন্ন মাযহাবের (school of thought) উপস্থিতি সত্ত্বেও মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের ক্ষেত্র তৈরি করে এই দৃষ্টিভঙ্গি। এছাড়া এই পার্থক্যকরণের মাধ্যমে ইসলামকে তার মৌলিক (original), বিস্তৃত (board) ও বলিষ্ঠ, তেজস্বী ফর্মে রাখা উচিত যা মানব মনের জন্য খুলে দেয় সুযোগের আর সহজতার বিশাল পরিসর। এতে নেই কোনো অসহজতা, ক্লিষ্টতা, আর হাজারটা বিধিনিষেধের বেড়াজাল। আবার এই প্রশ্নও উঠতে পারে যে, “আপনি কি কুরআন এবং সুন্নাহকে সেই সব ব্যক্তির জন্য এমন একটি হাতিয়ারে পরিণত করতে চান, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আর ইজতিহাদের দরোজা উন্মুক্ত করে দিলে যারা নিজ নিজ খেয়ালের আর প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে ইচ্ছামতো অপব্যাখ্যায় নিয়োজিত থাকবে?” অবশ্যই এর উত্তর হলো- “না”। ইসলামী প্রসঙ্গে যখন “মতামত” শব্দটি উচ্চারিত হয় তখন এটা শুধুই “মতামত”, কোনো খেয়াল খুশি নয়। বরং ইসলামী জগতে কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে তার সমাধান হতে হবে ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে। বৈজ্ঞানিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে স্বচ্ছ নিয়ম-নীতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টাতে কোনো ক্ষতি নেই। এটি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গঠিত শরীয়াহ্ স্টাডিজের (studies) ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ তৈরিকে নিশ্চিত করতে পারে। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি বৈধ সিস্টেমেই এরকম প্রচেষ্টার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বরং এ ধরনের প্রচেষ্টাকে নিশ্চিত করা আমাদেরই কর্তব্য। আর এভাবেই খেয়াল-খুশি এবং প্রবৃত্তির বশবর্তী ব্যাখ্যা দ্বারা শরীয়াহ্র ধারণাকে দুষ্ট করার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। তবে একই সময়ে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এ ধরনের স্পেশালাইজেশন যেন মুসলিম সমাজে কোনো পুরোহিততন্ত্রের জন্ম না দেয়। সব ধরনের মতামতকে বিবেচনায় আনার জন্য এর দরোজাকে করে দিতে হবে উন্মুক্ত। মতামতের উৎস যেখানেই হোক তাকে হতে হবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ওজনদার।

(লেখাটি ১৯৬৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তৎকালীন সময়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক “Young Pakistan”-এর ১৯ নম্বর ভল্যুমের ১১ নম্বর সংখ্যায় ছাপা হয়। পত্রিকাটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো। বর্তমান লেখায় প্রথম সমস্যাটিকে তুলে ধরা হয়েছে।

পরের দুইটি সমস্যা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। “Young Pakistan”-এ লেখাটি নেয়া হয়েছিল তার পুস্তিকা Three major problems confronting the Muslim world থেকে।)

সূত্রঃ জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত “সংস্কৃতিঃ জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০৪” স্মারক গ্রন্থ

সাঈদ রামাদান

ড. সাঈদ রামাদান মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ হাসান আল-বান্নার জামাতা এবং সমকালীন ইসলামী চিন্তাবিদ তারিক রমাদানের পিতা। গামাল আব্দুল নাসেরের শাসনামলে মিশর থেকে নির্বাসিত হয়ে সৌদি আরবে চলে যান। সেখানে তিনি 'Muslim World League' নামক একটি দাতব্য-মিশনারী গ্রুপের সাংবিধানিক পরিষদের মূল সদস্যদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তারপর তিনি University of Cologne থেকে dissertation শেষ করার আগেই ১৯৫৯ সালে জেনেভা (সুইজারল্যান্ড) এ চলে আসেন। তিনি ১৯৬১ সালে 'Islamic Center in Geneva' নামে একটি প্রতিষ্ঠান করেন। এটি ছিল মসজিদ, ইসলামী চিন্ত-গবেষণা ও মুসলমাদের একত্র হওয়ার সেন্টার। তাঁর সুযোগ্য পুত্র হানি রমাদান এখন সেই সেন্টার পরিচালনা করছেন।